ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2274-2280
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.490

বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্পে মানবজীবনের বহুমাত্রিক রূপ: এক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

মন দেবনাথ, *স্বাধীন গবেষক, কোকরাঝাড়, অসম, ভারত*

Received: 12.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bonophul played a significant role in the development of the Bengali short story by portraying the complexities of the human psyche and social reality within a remarkably concise narrative framework. His short stories vividly depict the multifaceted nature of human life, psychological complexities, social inequality, moral dilemmas, love, selfishness, satire, and the harsh realities of existence through a restrained and suggestive style of expression. The present research paper attempts to analyse the multifaceted dimensions of human life through a study of Bonophul's selected short stories. The primary objective of this study is to examine how the author artistically represents the interrelationship among human behaviour, social position, and the surrounding socio-cultural realities. Although the characters in his stories are shaped by social conventions, economic conditions, and personal experiences, they possess distinct psychological identities that are convincingly developed. His restrained language, suggestive narrative technique, and insightful characterization impart profound significance to his stories. Despite their brevity, each of Bonophul's short stories conveys a meaningful message and concludes with an element of surprise. This study seeks to provide a comprehensive understanding of the distinctive characteristics of characterisation in Bonophul's short stories as well as his unique contribution to the tradition of the Bengali short story.

Keywords: Bonophul, Short Stories, Human Life, Society, Bengali Literature, Characterization

বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) বাংলা কথাসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক। সমাজই সাহিত্যের আয়না। একজন প্রতিভাবান লেখক তাঁর জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীল কল্পনা ও শিল্পরীতির মাধ্যমে সাহিত্যের রূপ দেন। ফলত সাহিত্য শুধু নন্দনতাত্ত্বিক বিষয় নয়, তা সমাজ ও সমাজে বসবাস করা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বনফুল পেশাগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন। সাহিত্যিকতা ও চিকিৎসকতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরু হলেও বনফুলের সাহিত্য জীবনে কর্মজীবনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পেশাগত জীবনের তাগিদে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সংযোগ। তিনি সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম ও তাদের অন্তর্জগতের ভাবনাগুলোকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। চিকিৎসক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সেই জীবন দর্শন, অভিজ্ঞতা ও আত্মউপলব্ধি তাঁকে সাহিত্যিক বনফুল করে তুলেছে। তাঁর রচিত সাহিত্যে মানব জীবনের বহুমাত্রিক রূপ, সামাজিক বৈষম্য,

পারিবারিক সম্পর্ক, আশা-নিরাশা, নৈতিক সংকট এবং মানুষের অন্তর্জগত অত্যন্ত সহজ এবং শক্তিশালী শিল্প ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বনফুলের ফুল' গ্রন্থে বনফুলের সাহিত্য রচনার অসামান্য দক্ষতার গুণগান করে বলেছেন-

> "বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক। তিনি কবিও ছিলেন। কবিতা বুঝতেন, কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর চোখ ছিল সজাগ-বাইরের দিকে, অতদ্রিত ভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়।"[১]

এক্ষেত্রে ড. সুকুমার সেন দুই প্রকার সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে রয়েছেন গুটিপোকার দল, অপরদিকে বাবুই পাখির দল। দুই দলের বাসা নির্মাণেই বিস্তর পার্থক্য এবং বৈচিত্র বিদ্যমান। তবে বনফুলকে তিনি বাবুই পাখির দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ বাবুই পাখির বাসা নির্মাণের যে দক্ষতা ও কারুকার্যতা তা বনফুলের সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই।

বনফুলের রচিত সাহিত্যের তালিকা দীর্ঘ। প্রায় ৬০ টি উপন্যাস, ৫০০ এর অধিক ছোটগল্প, একাধিক নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা উপহার দিয়েছেন তিনি বাংলা সাহিত্যকে। লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর অপর এক বিশেষ গুণ হলো তিনি প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'তৃণখন্ড' (১৯৩৫), 'বৈতরণী তীরে' (১৯৩৬), 'দ্বিরথ' (১৯৩৭), 'নির্মম' (১৯৪০), 'মানদণ্ড' (১৯৪০), 'স্থাবর' (১৯৫১), 'পঞ্চপর্ব' (১৯৫৪) ইত্যাদি।

এছাড়াও তাঁর উৎকৃষ্ট ছোটগল্পগুলো হলো- 'নিমগাছ', 'ক্যানভাসার', 'মানুষ', 'হাটে বাজারে', 'অবাক পৃথিবী', 'বৈতরণী', 'রূপকথা', 'তাজমহল', 'আত্মপর', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'শ্রীপতি সামন্ত', 'বিধাতা', 'ছুরি', 'বন্দী', 'মুখোশ', 'প্রতিশোধ', 'অপরাধী', 'দুই বন্ধু', 'ভিখারি', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সমাধান', 'শেষ কথা' ইত্যাদি।

বনফুলের পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ও একজন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। ফলত বাল্যকাল থেকেই তিনি নানা মানুষের সংস্পর্শে বড় হয়ে উঠেছেন। এরপর নিজ কর্মজীবনেও তিনি একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। মানব জীবনের বহুমাত্রিক রূপ তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে, যা তার ছোট গল্পগুলো আলোচনা করলে অনায়াসে ধরা পড়ে। বাংলা ছোটগল্পে বনফুল অল্প কথায় গভীর জীবনবোধ প্রকাশের জন্য সুপরিচিত।

বনফুলের রচিত একটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প হল **মানুষ**। গল্পটি আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও ভাবের দিক থেকে অত্যন্ত গভীর। লেখক একজন সংবেদনশীল পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনকে দেখিয়েছেন। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশের পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র, শ্রম, জন্ম-মৃত্যু, আনন্দ-বেদনা, যুদ্ধ, বৈষম্য ও মানবিক সহমর্মিতার নানা চিত্র পরপর উঠে এসেছে। কোন দীর্ঘ কাহিনি বা জটিল চরিত্র নির্মাণ ছাড়াই বনফুল মানুষের অস্তিত্বের বহুমাত্রিক সত্যকে তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রথমে গঙ্গাবক্ষে সূর্যাস্তের এক সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনা এবং পরক্ষণেই সেই সৌন্দর্যের মাঝে মানব বাস্তবতার প্রবেশ ঘটেছে। প্রথমত, দুই ভিক্ষুক দুজনের উদ্দেশ্য একটাই "ক্ষুধার অন্ন চাই"[২]। সেই অন্ন যোগাবার পন্থাও এক- ভিক্ষা, অথচ তাদের অস্ত্র আলাদা- "সেই ব্যবসায় একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে, আর একজন যৌবনকে।"[৩] কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী যার একমাত্র অস্ত্র তার এই ব্যাধি, সেই ব্যাধিকে হাতিয়ার করে সে মানুষের হৃদয়ে সহানুভূতির সৃষ্টি করে এবং এভাবেই চলছে তার জীবন ও জীবিকা। যে ব্যাধিকে সে তার জীবিকা নির্বাহের হাতিয়ার করেছে সেই ব্যাধিই তার এই জীবিকা গ্রহণের জন্য দায়ী এবং তার পাশাপাশি সমপরিমাণে দায়ী সমাজের সুস্থ মানুষের অস্পৃশ্যতা। অপরদিকে নবমুকুলিত যৌবনপ্রাপ্ত যুবতী ভিখারিনী, সে তার যৌবনকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। মেয়েটির বয়স ষোলো-সতেরো,

পরনে শতছিদ্র পোশাক। তার এই পরিস্থিতিই তার জীবিকা। তার দরিদ্রতা তাকে বয়সের পূর্বেই বড় করে তুলেছে। সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে সে স্পষ্টতই অবগত। তাই সে তার যৌবনকে তুলে ধরেছে সমাজের উদ্দেশ্যে, তার বেঁচে থাকার তাগিদে। বিড়ালটা যেরূপ দীর্ঘ সময় ওৎ পেতে মুহূর্তেই ইদুরটাকে গোগ্রাসে নিঃশেষ করে ফেলেছে, ঠিক তেমনি সেই গলির অন্ধকারে থাকা কোন এক গুন্ডা গুছের লোকের গোগ্রাসে নিঃশেষ হয়ে যাবে উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিণী। একদিকে খবরের কাগজের মৃত্যু সংবাদ অপরদিকে পাশের বাড়ির নতুন শিশুর জন্ম, দুটি বিপরীত ঘটনা একই সময়ে ঘটিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনি জন্ম জীবনের অবিচ্ছেদ্য সত্য।

নিমগাছ গল্পে বনফুলের জীবনদর্শন অত্যন্ত সংবেদনশীল। গল্পে নিমগাছ কেবল একটি বৃক্ষ নয়, এটি অতীত ও বর্তমানের সংযোগসূত্র। মানুষ যেমন প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে ঠিক তেমনি প্রকৃতিও মানুষের জীবনকে নীরবে ধারণ করে। সময় পাল্টে যায়, মানুষ বদলে যায় অথচ সময় ও মানুষের সেই নিবিড় স্মৃতি বহন করে নিমগাছ। মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন এলেও নিমগাছ একই স্থানে দাঁড়িয়ে সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। নিমগাছের পাতা থেকে শুরু করে ডাল-পালা-কান্ড হয়ে শিকড় পর্যন্ত মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই গাছ নিঃস্বার্থভাবে নিজের সমস্তটা বিলিয়ে দিয়ে আসছে। এত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যত্ন ও পরিচর্যার পরিবর্তে তাকে দেয়া হয় আবর্জনার স্তূপ। সেই স্তূপেই দিনের পর দিন আমৃত্যু এভাবেই মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে।

এই গাছ শুধু অবলা বৃক্ষরাজীর হয়ে প্রতিবাদ করেনি, তা মৌন ভাবে বেঁচে থাকা গ্রাম্য গৃহবধূ সকলের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে নারী তার সমস্ত জীবনটা কখনো স্বামী কখনো সন্তান আবার কখনো বা সংসারের প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য নিজেকে বিলীন করে দেয়, তার পরিবর্তে তাকে শুধুই আবর্জনা স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা শখ-আহ্লাদ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে অন্যের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। সংসারের এই মোহজালে নারী নিজেকে এতটাই বিলিয়ে দেয় যে সে চাইলেও তা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না- "নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগলো লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পেছনে আবর্জনার স্তুপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে। ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুনা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।"[৪] সম্পূর্ণ গল্পটি নিমগাছের গুণকীর্তন করে অগ্রসর হলেও শেষের এই একটি বাক্য সমস্ত গল্পটির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শেষের এই একটি বাক্যই যেন গল্পের মূল অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে।

ক্যানভাসার গল্পে মানব জীবনের দায়বদ্ধতার ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে বেকার ভৈরব ও কাত্যায়নীর সংসারের অভাব অনটন ও দাম্পত্য কলহ, অপরদিকে দাঁতের মাজন বিক্রেতা বৃদ্ধ ক্যানভাসার হীরালালের জীবন সংগ্রাম। গল্পটি বাহ্যিকভাবে বিক্রয় প্রচেষ্টার গল্প হলেও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বহুমাত্রিক। গল্পে ক্যানভাসার হীরালালের আগমন কেবল মাজন বিক্রেতা হিসেবে নয়, সমাজের বাজার ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে। মানুষ প্রতিনিয়তই বাইরের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে চলছে, ঠিক ভুলের বিচার না করে মানুষ সর্বদা নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত। মানব সমাজের এই দিকগুলোকে লক্ষ্য করে অপর একদল মানুষ সুবিধাবাদী হয়ে উঠছে। মাজনের গুণাগুণ বর্ণনার মাধ্যমে হীরালাল মানুষের মনে প্রয়োজনের অনুভূতি তৈরি করতে চায়। তার বক্তব্যে যুক্তির তুলনায় প্রলোভনের প্রাধান্য বেশি। কেননা মানুষের চাহিদা সৃষ্টি করাই তার ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দন্তহীন হীরালাল আশ্রয় নিয়েছে বাঁধানো দন্ত পার্টির। তবে তার এই ব্যবসার পেছনে রয়েছে তার দরিদ্রতা ও দায়বদ্ধতা-

"গরিব মানুষ- এই ক'রে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে-।"[৫]

সমাজের দায়বদ্ধতায় মানুষকে অনেক সময় সেই কাজটিও বেছে নিতে হয় যার জন্য সে কখনো প্রস্তুত ছিল না।

তবে ভৈরব আত্মসম্মান ও নৈতিক চরিত্রের প্রতিনিধি। বেকারত্বের তিক্ততা ও সংসারের চাওয়া-পাওয়ায় সে অতিষ্ট। তাই জগতের বাহ্যিকরূপে মুগ্ধ না হয়ে সে ভেতরের আসল গুণাবলী পরখ করে দেখতে সক্ষম। তাই উত্তপ্ত বেকার ভৈরব শেষে এক কৌটা মাজন কিনতে বাধ্য হয়-

> "হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল, আচ্ছা, দিন এক কৌটা মজান।"[৬]

শেষের এই পরিণতিই গল্পের মূল তাৎপর্য।

তাজমহল গল্পে মানবিকতার চিরন্তন জয় ও স্মৃতির পুনঃনির্মাণ করেছেন কথাসাহিত্যিক বনফুল। গল্পের শুরুতে কথক তাজমহলকে প্রেমের স্মারক হিসেবে দেখেন। সময়ের সাথে সাথে তাজমহলের সেই শ্বেতশুভ্র রূপ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে ও তার মধ্য দিয়ে মানবিকতার উপলব্ধি ঘটে। স্থাপত্যের জৌলুস ধীরে ধীরে সাধারণ হয়ে যায়, অথচ মানবিক আদর্শ কখনো ম্লান হয় না। লেখক তাজমহলকে শুধু দাম্পত্য প্রেমের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেননি, মানব প্রেমের স্বার্থে বিলিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাস ও বর্তমান দুই সময়ের দুই শা-জাহান প্রেমের দুই নিগূঢ় পথ দেখিয়েছে। তাজমহলকে প্রতীক করে মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আত্মত্যাগ এবং সেবার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অমরত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে ফকির শা-জাহান। শূন্য হাতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েও তারা সর্বসুখী দাম্পত্য, যেখানে কোন চাওয়া পাওয়া নেই, আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু আছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। ফকির ও তার বেগম উভয়েই নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত, তাই জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। নিরুপায় হওয়া সত্ত্বেও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে একে অপরের-

> "একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘুরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেবা দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠকঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।"[৭]

এবং শেষে সমস্ত জগৎ, সম্পদ তার একমাত্র সঙ্গীকে হারিয়ে তার একমাত্র পরিচয় সে এখন- "ফকির শা-জাহান!"[৮]

অপরদিকে কথক চিকিৎসক তার উদার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার আত্মউপলব্ধি মধ্য দিয়ে। যে নিরীহ বৃদ্ধ দাম্পত্যকে সকলে ঘৃণ্য বলে দূরে ঠেলে দেয়, সেই দাম্পত্যের ব্যথা বেদনা চিকিৎসকের নিজ হৃদয়ে ব্যথিত হয়। তাই চিকিৎসকের কাছে ফকির শা-জাহানের বেগমের কবর শ্বেতশুভ্র তাজমহলেরই সমকক্ষী, যেন এই কবরই প্রকৃত তাজমহল। ফকির শা-জাহানের জীবনদর্শনই এই গল্পের প্রকৃত তাজমহল, যা পাথরের নয় মানবতার ভিত্তির ওপর নির্মিত।

সমাধান গল্পের লেখক সমাজের অকথ্য এক বৃহৎ সমস্যার চিত্র অঙ্কন করেছেন। একটি কন্যা সন্তানের জন্ম, তার বড় হয়ে উঠা ও বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত একজন পিতার যে দায়ভার তার এক দীর্ঘ ইতিহাস খুবই সীমিত সংখ্যক বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন লেখক সমাধান গল্পে। সমাজের এই বৃহৎ সমস্যা পেছনে দায়ী সমাজেরই মানুষজন। কন্যা সন্তান জন্মানোর মুহূর্তেই সমাজ সেই সন্তানের পিতাকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাতে রূপান্তরিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। সমাধান গল্পে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতিনিধি নীহাররঞ্জন। নীহাররঞ্জন বিবাহের বছরান্তেই কন্যারত্নের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তবে তার সৌভাগ্য অচিরেই কেটে যায়, মেয়েটির বাহ্যিক রূপ কদাকার, দেহের রং কালো-

> "মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রং তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তাছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরনের, মুখে সর্বদাই লালা ঝরে। পুষ্পমঞ্জুরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।"[৯]

সমাজের এই সিদ্ধান্ত কেউ নীহাররঞ্জন মাথা পেতে নেয় এবং মেয়ের নাম হয় পুষ্পমঞ্জুরীর পরিবর্তে বুঁচি। একটি সদ্যোজাত শিশু যার জগত কিংবা সমাজ সম্পর্কে ন্যূনতম বোধ বুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না তাকেও সমাজের বিচার মন্ডলীরা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পিছপা হয় না। সেই কন্যা যখন ধীরে ধীরে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে সমাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন তাকে গ্রাস করার জন্য আরোও তৎপর হয়ে ওঠে। ফলত একটি কন্যাসন্তানের জন্মলগ্ন থেকেই কত শত নীহাররঞ্জনেরা দুশ্চিন্তায় ভোগে- "বিয়ে দেবার সময় নাকের জল চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।"[১০] তবে বর্তমান সময়ে টাকার অংকটা যতই বড় হোক না কেন তার ওপর রূপের ওজন হওয়া চাই- "হারু খুড়ো তামাকটাতে দু'টান দিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হ'লেই হয় না। লোকে টাকাও চায়, রূপও চায় যে।"[১১] এমতাবস্থায় হাজার হাজার দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা সমাজে সসম্মানে বেঁচে থাকার তাগিদে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে নেয়, নয়তো কন্যাকে অপাত্রে দান করে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। তবে গল্পে দুই বছরের বুঁচি মরে গিয়ে নীহাররঞ্জন ও সমাজ উভয়েরই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যায়। নীহাররঞ্জন মুক্তি পায় তার কন্যাদায়গ্রস্ততা থেকে, সমাজ মুক্তি পায় তার বিচার ব্যবস্থা থেকে। ক্ষুদ্র আয়তনের এই গল্পে বনফুল সমাজের এই বৃহৎ তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প দক্ষতার মাধ্যমে।

শ্রীপতি সামন্ত গল্পে বনফুল শ্রেণীবিভাজনের নির্মম বাস্তবতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পের সূচনাতেই লেখক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং মধ্যম বগীর প্রসঙ্গ তুলে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের একটি প্রতীকী চিত্র নির্মাণ করেছেন। ট্রেনের এই শ্রেণীবিন্যাস সমাজের মানুষের শ্রেণীবিন্যাসকেই নির্দেশ করে। গল্পের সূচনাতেই শ্রীপতি সামন্ত ঘুমের তীব্র প্রয়োজন অনুভবে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়েও প্রথম শ্রেণীতে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সমাজে একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারণ করে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও বাহ্যিক বেশ-ভূষা। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে সামাজিক পরিচয় হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের অহংকার, সামাজিক মর্যাদার কৃত্রিমতা এবং শ্রেণীগত দূরত্বকে লেখক সূক্ষ্ম কৌতুকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। গল্পটি প্রধানত ব্যাঙ্গ রসাত্মক, মানুষের আচার-আচরণ, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি বিষয়গুলো যে তার শ্রেণী নির্ধারণ করতে পারেনা তা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন লেখক বনফুল।

গল্পের শেষে শ্রীপতি সামন্ত উপলব্ধি করায় নিজের স্বার্থের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনে সহায় হওয়াটাই প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর লোকেদের পরিচয়। সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণীগত পরিচয়ের চেয়ে মানুষের কষ্ট ও প্রয়োজন অনেক বেশি মূল্যবান- "কটা টাকা লাগবে বলুন, আমি দিয়ে দি। ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।"[১২] শ্রীপতি সামন্ত শুধু একজন সাধারন বাঙালি নয়, সে সমগ্র বাঙালি জাতির হয়ে প্রতিবাদ করেছে পাঞ্জাবি ক্রু-এর সাথে। মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব এবং সামাজিক ভন্ডামীর বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম প্রতিবাদ জানিয়েছেন বনফুল তাঁর ব্যঙ্গাতক চরিত্র শ্রীপতি সামন্তের মধ্য দিয়ে। তিনি সমাজের মানুষের এই বহুমাত্রিক রূপগুলো নির্দ্বিধায় সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তার এই গল্পগুলোকে প্রতীকী করে।

ছেলে ও মেয়ে গল্পের লেখক বনফুল পুত্রসন্তানের প্রাধান্য ও সমাজবাস্তবতার নির্মম রূপ তুলে ধরেছেন। ছেলে ও মেয়ে গল্পের দুই নারী, আন্নাকালী সাতটি কন্যা সন্তানের জননী ও গর্ভে অষ্টম সন্তান, অপরদিকে নমিতা প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করছে। গল্পের শুরুতে দুই নারীর পুরুষ সমাজের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নিজেদের স্বামীর দোষ ত্রুটি দিয়ে শুরু করে সমাজের ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন কুকর্ম ও চরিত্র

দোষের কাহিনী আদান-প্রদান করেছে অন্নকালী ও নমিতা। পুরুষ সমাজকে তারা তুলনা করেছে কাছিমের সঙ্গে, পুরুষেরা যেন সর্ব সুখ ভোগী, জল-স্থল উভয়েরই সুবিধা নেয়, বিপদের সম্ভাবনায় নিজেকে কঠিন আবরণের ভেতরে সর্বদা গুটিয়ে রাখে ও সুযোগ পেলেই কামড়ে ধরে- "জেদি, ভীতু, একগুঁয়ে-অবিকল কাছিম সব।"[১৩] দুই নারীরই পুরুষ জাতের ওপর রয়েছে অজস্র ঘৃণা। অথচ অন্নাকালী পরপর সাতটি কন্যাসন্তানের পর পুত্রসন্তান লাভের আশায় অষ্টমতম বার গর্ভবতী।

গল্পে নারীর অসহায় অবস্থা স্পষ্টই ধরা পড়ে। আধুনিক সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও কিছু কিছু চিরাচরিত প্রথা এখনো মানুষের মস্তিষ্কে প্রবাহমান হয়ে চলছে। একজন নারী সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই তার সন্তানের লিঙ্গ মূল্যায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। পুরুষ জাতিকে ঘৃণা করা অন্নাকালী তার অষ্টমতম কন্যা সন্তানকে গ্রহণ করতে নারাজ- "না মেয়ে আমি চাই না-চাই না-চাই না,- আমার ছেলে এনে দাও, আমার ছেলে এনে দাও-নিশ্চয়ই আমার ছেলে হয়েছে।"[১৪] এর কারণ হিসেবে বলা যায় আমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা ও আমাদের মানসিকতা। বহু পরিবারের পুত্র সন্তানকে গৌরব ও কন্যা সন্তানকে হতাশার কারণ হিসেবে দেখা হয়, তাই সমাজের দৃষ্টিতে নারীর ব্যক্তিসত্ত্বা ও মাতৃত্বের অনুভূতির চেয়ে সন্তানের লিঙ্গ বেশি গুরুত্ব পায়। এবং শেষে নিজের কন্যা সন্তানকে গ্রহণ না করে অন্যের পুত্র সন্তানকে নিজের বলে দাবি করার মত নাটকীয় পরিস্থিতি পাঠকের মনে গভীর আলোড়ন তুলে এবং সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন জাগায়।

ছেলে ও মেয়ে গল্পে বনফুল পুত্র সন্তান কেন্দ্রিক সামাজিক মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বনফুল দেখিয়েছেন সন্তানের মূল্য তার লিঙ্গে নয়, তার মানবিক অস্তিত্বে। কোনো উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ নয় বরং স্বাভাবিক জীবনের একটি ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজের গভীর অসুস্থতাকে উন্মোচন করেছেন।

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে বনফুল এমনই একজন স্রষ্ঠা, যিনি ভাষার সংগ্রাম এবং ভাবের গভীরতার মাধ্যমে নিজস্ব সাহিত্যভুবন নির্মাণ করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় সমাজের মানুষের এক একটি রূপ অঙ্কন করেছেন। অত্যন্ত সহজ সরল মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাকেও তিনি ছোট ছোট গল্পকারে বৃহৎ মর্যাদার অধিকারী করেছেন। তাঁর ক্ষুদ্র আয়তনের এই রচনাগুলোতে শব্দের বাহুল্য নেই; বরং প্রতিটি শব্দই অর্থবহ এবং নির্দিষ্ট অর্থ পূরণের জন্য ব্যবহৃত। এই ভাষা সংগতি তাঁর সাহিত্যকে একদিকে যেমন সহজবোধ্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি চিন্তামূলক ও শিল্পসম্মত মর্যাদা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার। প্রবন্ধ সংকলন- ৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪, কলকাতা, পৃ. ১৬৫।
২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। বাণীশিল্প, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, কলকাতা, পৃ. ৬২।
৩. তদেব, পৃ. ৬২।
৪. তদেব, পৃ. ১৫২।
৫. তদেব, পৃ. ৫৬।
৬. তদেব, পৃ. ৫৬।
৭. তদেব, পৃ. ১৬২।
৮. তদেব, পৃ. ১৬৩।
৯. তদেব, পৃ. ২২।
১০. তদেব, পৃ. ২২।

১১. তদেব, পৃ. ২২।
১২. তদেব, পৃ. ৬০।
১৩. তদেব, পৃ. ১২০।
১৪. তদেব, পৃ. ১২১।

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। বাণীশিল্প, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, কলকাতা।
২. সেন, সুকুমার। প্রবন্ধ সংকলন- ৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪, কলকাতা।